

অব্যক্ত

জগদীশচন্দ্র বসু

প্রকাশ কালঃ ১৯২১

Published by

porua.org



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম:

৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮

মৃত্যু:

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭

সূচী

<u>যুক্তকর</u>	<u>১</u>
<u>আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ</u>	<u>৬</u>
<u>গাছের কথা</u>	<u>১৯</u>
<u>উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু</u>	<u>২৫</u>
<u>মন্দের সাধন</u>	<u>৩১</u>
<u>অদৃশ্য আলোক</u>	<u>৪০</u>
<u>পলাতক তৃফান</u>	<u>৫৬</u>
<u>অগ্নি পরীক্ষা</u>	<u>৬৭</u>
<u>ভাগীরথীর উৎস-সন্ধান</u>	<u>৭৭</u>
<u>বিজ্ঞানে সাহিত্য</u>	<u>৮৭</u>
<u>নির্বাক জীবন</u>	<u>১০৭</u>
<u>নবীন ও প্রবীণ</u>	<u>১২১</u>
<u>বোধন</u>	<u>১২৮</u>
<u>মনন ও করণ</u>	<u>১৪৩</u>
<u>রাণী-সন্দর্শন</u>	<u>১৪৯</u>
<u>নিবেদন</u>	<u>১৫১</u>
<u>দীক্ষা</u>	<u>১৬৯</u>
<u>আহত উদ্ভিদ</u>	<u>১৭২</u>
<u>স্বায়সূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ</u>	<u>১৯৩</u>
<u>হাজির</u>	<u>২০৭</u>

অব্যক্ত

যুক্তকর

পুরাতন লইয়াই বর্তমান গঠিত, অতীতের ইতিহাস না জানিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেকালে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইত, তাহা জানা আবশ্যিক। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলাম, দেড় হাজার বৎসর পূর্বের জীবন্ত চিত্র এখনও অজন্তর গুহামন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পথ অনেক সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু বহুবৎসর পূর্বের যখন অজন্তা দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন রাস্তাঘাট বিশেষ কিছুই ছিল না। রেল-স্টেশন হইতে প্রায় এক দিনের পথ। বাহন গরুর গাড়ী। অনেক কষ্টের পর অজন্তা পৌঁছিলাম। মাঝখানের পার্বত্য নদী পার হইয়া দেখিলাম, পর্বতে খুদিয়া গুহাশ্রেণী নির্মিত হইয়াছে; ভিতরে কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা। গুহার প্রাচীর ও ছাদে চিত্রাবলী অঙ্কিত; তাহা সহস্রাধিক বৎসরেও ম্লান হয় নাই। দরবার চিত্রে দেখিলাম, পারস্য দেশ হইতে দূত রাজদর্শনে আসিয়াছে। অন্য স্থানে ভীষণ সমর চিত্র। তাহাতে একদিকে অশ্বশস্ত্রে ভূষিতা নারীসৈন্য যুদ্ধ করিতেছে। আর এক কোণে দেখিলাম, দুইখানা মেঘ দুই দিক হইতে আসিয়া প্রহত হইয়াছে। ঘূর্ণায়মান বাষ্পরাশিতে মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা পরম্পরের সহিত ভীষণ রণে যুঝিতেছে। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এখনও চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী আলো ও আঁধার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম ও অধর্ম। যখন সবিতা সপ্ত অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে পূর্বদিকে উত্তীর্ণ হইবেন, তখনই আঁধার পরাহত হইয়া পশ্চিম গগনে মিলাইয়া যাইবে।

আর একখানি চিত্রে রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্যাধি-জর্জরিত, শোকার্ত মানবের দুঃখ তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছে। কি করিয়া এই দুঃখপাশ ছিন্ন হইবে, তিনি আজ রাজ্য ও ধনসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইবেন। আজ মহাসংক্রমণের দিন।

অর্দ্ধ-অন্ধকার-আচ্ছন্ন গুহামন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম পর্বতগাত্রে প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। সুখ-দুঃখের অতীত শান্তির পথ তাঁহারই সাধনার ফলে উন্মুক্ত হইয়াছে।

সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, ততদূর জনমানবের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অকাট্য ব্যবধান, পারাপারের কোনো সেতু নাই। গুহার অন্ধকারে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের পুরী। অশান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

ইহার কয় বৎসর পর কোনো সম্ভ্রান্ত জনভবনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেখানে অনেকগুলি চিত্র ছিল; অন্যমনস্কভাবে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একখানা ছবি দেখিয়া চমকিত হইলাম। এই ছবি তো পূর্বে দেখিয়াছি— সেই গুহামন্দিরের প্রশান্ত বুদ্ধমূর্তি! চিত্রে আরও কিছু ছিল যাহা পূর্বে দেখি নাই। মূর্তির নীচেই একখানা পাথরের উপরে নিদ্রিত শিশু, নিকটেই জননী উর্দ্ধোখিত যুক্তকরে পুত্রের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছে। যিনি সমস্ত জীবের দুঃখভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই মায়ের দুঃখ দূর করিবেন। অমনি মানস-চক্ষে আর একটি দৃশ্য দেখিলাম। বোধিবৃক্ষতলে উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু গৌতম। দুস্থজন দেখিয়া সুজাতার মাতৃহৃদয় উথলিত। দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্তমানের মাঝখানে মমতা ও স্নেহরচিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান ঘুচিয়া গেল।

আমার পার্শ্বে একজন বিদেশী বলিলেন—দেখ, দেবতার মুখ কিরূপ নির্মল—একদিকে মাতার এত আগ্রহ, এত স্তুতি, কিন্তু দেবতার কেবল নিশ্চল দৃষ্টি! এই অবোধ নারী প্রস্তরমূর্তির মুখে কিরূপে করুণা দেখিতে পাইতেছেন?

তখন প্রকৃতির উপাসক জ্ঞানীদের কথা মনে হইল। এই অবোধ মাতা ও অজ্ঞাতবাদী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কি এতই প্রভেদ?

প্রকৃতিও কি ক্রুর নয়? তাহার অকাট্য অপরিবর্তনীয় লৌহের ন্যায় কঠিন নিয়মশৃঙ্খলে কয়জনে মমতা দেখিতে পায়? অনন্তশক্তি চক্র যখন উদ্ধতবেগে ধাবিত হয় তখন তাহা দ্বারা পেষিত জীবগণকে কে তুলিয়া লয়?

সকলে প্রকৃতির হৃদয়ে মাতৃস্নেহ দেখিতে পান না। আমরা যাহা দেখি তাহা ত আমাদের মনের প্রতিকৃতি মাত্র। যাহার উপর চক্ষু পড়ে তাহা কেবল উপলক্ষ্য। কেবল প্রশান্ত গভীর জলরাশিতেই প্রকৃত প্রতিবিশ্ব দেখিলে দেখা যায়। এই বিদ্রুত জলরাশির ন্যায় সদা-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে কিরূপে নিশ্চল প্রতিমূর্তি বিদ্যিত হইবে?

যাঁহার ইচ্ছায় অনন্ত বারিধি বাত্যাভাঙনে ক্ষুব্ধ হয়, কেবল তাঁহার আঙ্ঘাতেই জলধি শান্তিময়ী মূর্তি ধারণ করে। কে বলিবে ঐ অবোধ মাতার হৃদয় এক শান্তিময় করস্পর্শে কমণীয় হয় নাই?

আমরা যাহা দেখিতে পাই না, পুত্রবাসল্যে অভিভূত ধ্যানশীলা জননী তাহা দেখিতে পান। তাঁহার নিকট ঐ প্রস্তরমূর্তির পশ্চাতে স্নেহময়ী

জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিভাসিত! দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইল যেন
উর্দ্ধ হইতে অমৃত ক্ষীরধারা পতিত হইয়া মাতা ও সন্তানকে শুভ্র ও পবিত্র
করিয়াছে।

অনেক সময়ে এক অপূর্ণতা আসিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও সজীবতা
অপহরণ করে। আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখমিশ্রিত দৃশ্য
অসামঞ্জস্যহেতু অশান্তিপূর্ণ হয়; অথচ আলো ও অন্ধকারের সমাবেশ ভিন্ন
সুচিত্র হয় না। কেবল আলো কিম্বা কেবল অন্ধকারে চিত্র অপরিষ্কৃত থাকে।
যে দৃশ্যের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার ন্যায় জীবনচিত্র অনেক সময়
সৌন্দর্য্যহীন হয়। ঐ চিত্রের ন্যায় একটি শিশু কিম্বা নারীর উর্দ্ধোণ্ডিত বাহুতে
সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। আলো ও ছায়া, সুখ ও অপরিহার্য্য দুঃখ
তখন স্ব-স্ব নির্দিষ্ট স্থানে সমাবিষ্ট হয়। তখন সেই দুইখানি উত্তোলিত যুক্তহস্ত
হইতে কিরণ-রেখা অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত দৃশ্য জ্যোতির্ম্ময় করে।

আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ

দৃশ্য জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম লইয়া গঠিত। রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়। এ জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম অথবা আকাশ।

পদার্থ ত্রিবিধ আকারে দেখা যায়। ক্ষিত্যাকারে—অর্থাৎ কঠিনরূপে; দ্রব্যাকারে—অর্থাৎ অপেক্ষাকারে; বায়বাকারে—অর্থাৎ মরুৎরূপে। জড় পদার্থ সর্বসময়ে শক্তি অথবা তেজ দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে। এই মহাজগৎ ব্যোমে দোলায়মান রহিয়াছে। মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহারই বলে অসীম আকাশে বিশ্বজগৎ ভ্রমণ করিতেছে, উদ্ভূত হইতেছে এবং পুনরায় মিলাইয়া যাইতেছে।

সর্বত্র দেখা যাউক, শক্তি কি প্রকারে স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয়।

রেলের ষ্টেশনে সঞ্চিত প্রেরণের দণ্ড সকলেই দেখিয়াছেন। একদিকে রজ্জু আকর্ষণ করিলে দূরস্থ কাষ্ঠখণ্ড সঞ্চালিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারেও শক্তি সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যায়; কলের আঘাতে জল তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীতটে বারংবার আঘাত করে। এ স্থলে কলের আঘাত তরঙ্গবলে দূরে নীত হয়।

বাদ্যকরের অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীও এইরূপে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শব্দজ্ঞান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীতও সচরাচর অনেক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুকম্পিত বৃক্ষপত্র, জলবিন্দু পতনে, তরঙ্গাহত সমুদ্রতীরে বহুবিধ সুর শ্রুতিগোচর হয়।

সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেন্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না।

কে মনে করিতে পারে যে, শত শত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাই না? গৃহের বাহিরে নিরন্তর অগণিত সংগীত গীত হইতেছে; কিন্তু তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত।

জড় পদার্থের কম্পন ও তজ্জনিত সুরের কথা বলিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আকাশেও সর্বদা অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্গুলিতাড়নে প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ও তৎপরে বায়ুতে যেরূপ তরঙ্গ হয়, বিদ্যুত্বাডনেও সেইরূপে আকাশে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। বায়ুর তরঙ্গ আমরা কণ দিয়া শ্রবণ করি, আকাশের তরঙ্গ সচরাচর আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

বায়ুর তরঙ্গ আমরা অনেক সময়ে শুনিতে পাই না। আকাশের তরঙ্গও সর্বসময়ে দেখিতে পাই না।

দুইটি ধাতুগোলক বিদ্যুদ্যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্বাডিত হইবে এবং তড়িৎলে চতুর্দিকের আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে। তার ছোট করিলে, অর্থাৎ গোলক দুইটিকে ক্ষুদ্র করিলে সুর উচ্চে উঠিবে। এইরূপ প্রতিমুহূর্তে সহস্র কম্পন হইতে লক্ষ, লক্ষ হইতে কোটি এবং তাহা হইতে কোটি কোটি কম্পন উৎপন্ন হইবে।

মনে কর, অন্ধকার গৃহে অদৃশ্য শক্তিবলে বায়ু বারংবার আহত হইতেছে। কিছুই দেখা যাইতেছে না, কেবল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গভীর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কম্পনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা যাইবে, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সঙ্গমে উঠিবে। অবশেষে সহসা কণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তব্ধতায় পরিণত হইবে। ইহার পর লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ কর্ণে আঘাত করিলেও আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না।

এক্ষণে বিদ্যুৎলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাউক; লক্ষাধিক তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকে ধাবিত হইবে। আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব। সুর ক্রমে উচ্চে উত্থিত হইতে থাকুক; প্রতি সেকেণ্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে, তখন অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিবে, শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে। সুর আরও উচ্চে উত্থিত হইলে যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক-রেখা দেখা যাইবে। কম্পনসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক—ক্রমে ক্রমে পীত, হরিৎ, নীল আলোকে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর সুর আরও উচ্চে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ইহার পর অগণিত স্পন্দনে আকাশ স্পন্দিত হইলেও আমরা কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারিব না।

তবে ত আমরা এই সমুদ্রে একেবারে দিশাহারা! আমরা বধির ও অন্ধ! কি দেখিতে পাই? কি শুনিতে পাই? কিছুই নয়! দুই একখানা ভগ্ন দিক্‌দর্শন শলাকা লইয়া আমরা মহাসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছি।

পূর্বে বলিয়াছি, উত্তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন স্বক্ দ্বারা অনুভব করি তাহার নাম উত্তাপ; আর যে কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা

ব্যতীত আকাশে বহুবিধ স্পন্দন আছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

হস্তী-দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া অন্ধেরা একই জন্তুর বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়াছিল; শক্তি সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ কল্পনা করি।

কিয়ংকাল পূর্বে আমরা চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সকল একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। চুম্বকশক্তি ও বিদ্যুতের সম্বন্ধ সকলেই জানেন। তাপরশ্মি ও আলোক যে আকাশের বৈদ্যুতিক কম্পনজনিত, ইহা অল্পদিন হইল প্রমাণিত হইয়াছে।

আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, ধাতুপাত্রে প্রতিহত হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্তন করে, বায়ু হইতে অন্য স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়। কম্পনসংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

সূর্য্য এই পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের উপরে বায়ুমণ্ডল ৪৫ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। তার পর শূন্য। দূরস্থ সূর্য্যের সহিত এই পৃথিবীর আপাততঃ কোনও যোগ দেখা যায় না।

অথচ সূর্য্যের বহির্ময় সাগরে আবর্ত উথিত হইলে এই পৃথিবী সেই সৌরোৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়—অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎশ্রোত বহিতে থাকে।

সুতরাং যাহা বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচ্ছিন্ন নহে। শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশসূত্রে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন আকাশ বাহিয়া অন্য জগতে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া নানা রূপ ধরিতেছে। সূর্য্যকিরণেই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, পুষ্প রঞ্জিত হয়। কিরণরূপ আকাশ-কম্পন আসিয়া বায়ুস্থিত অঙ্গারক অণুগুলি বিচলিত করিয়া বৃক্ষদেহ গঠিত করে। অসংখ্য বৎসর পূর্ব্বের সূর্য্যকিরণ বৃক্ষদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথীগর্ভে নিহিত আছে। আজ কয়লা হইতে সেই কিরণ নিষ্কৃতি হইয়া গ্যাস ও বিদ্যুদালোকে রাজবর্ষ আলোকিত করিতেছে। বাষ্পযান, অণুবোত এই শক্তিতেই ধাবিত হয়। মেঘ ও বাত্যা একই শক্তিবলে সঞ্চালিত হইতেছে।

সূর্য্যকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে দেখা যায় যে, এই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব গতির মূলে সূর্য্যকিরণ। আকাশের স্পন্দন দ্বারাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে; জীবনের শ্রোত বহিতেছে।

আমাদের চক্ষুর আবরণ ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইল। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বহুরূপী বিবিধ শক্তিশালী জগতের মূলে দুইটি কারণ বিদ্যমান। এক, আকাশ ও তাহার স্পন্দন; অপর, জড় বস্তু।